OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 600 - 613
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

তেভাগা আন্দোলন ও নন্দীগ্রাম : কৃষক-প্রতিরোধ, ভূমি-সম্পর্ক ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার

সেখ জাহাঙ্গীর হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সীতানন্দ কলেজ, নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID: hossaindrskjahangir@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Tebhaga Movement; Nandigram; Peasant Resistance; Sharecroppers; Land Rights; Bimala Maji; Agrarian History.

Abstract
The Tebhaga Movement of 1946–47 marked a significant turning point in the history of peasant movements in Bengal. The principal demand of the movement was that sharecroppers should retain two-thirds of the crops they produced and give one-third to the landowner or jotedar. They also demanded that, after harvesting, the crops should be stored in the sharecropper's own granary rather than being taken to the jotedar's threshing floor. Thus, the Tebhaga Movement was not merely a dispute over the distribution of agricultural produce; it represented a broader struggle over rural power, control over production, and the social dignity and rights of peasants. Historical studies indicate that although North Bengal was one of the major centres of the movement, it also assumed a strong form in Mahishadal, Sutahata and Nandigram in Midnapore. The significance of Tebhaga in Nandigram is particularly noteworthy because the region already possessed a tradition of peasant resistance against zamindari exploitation and illegal exactions such as abwab. The Tebhaga Movement of 1946–47 gave a new political and class-oriented expression to these earlier forms of agrarian resistance. The roles of local activists and leaders such as Bhupal Panda, Ananta Maji and Bimala Maji, particularly in mobilising women, demonstrate the social depth and wider participation of the movement in Nandigram. Although the Nandigram movement of 2007 emerged in an entirely different political and economic context, issues of land, agrarian livelihood, the fear of displacement, and the deep social relationship between people and land remained central to the resistance. Therefore, rather than treating Tebhaga and the 2007 Nandigram movement as identical or directly continuous movements, they may be understood as two distinct historical phases reflecting the enduring memory of land rights, peasant identity and resistance in rural society.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : ভারতের ঔপনিবেশিক ইতিহাসে কৃষক-আন্দোলনগুলি কেবল অর্থনৈতিক প্রতিবাদের প্রকাশ ছিল না; এগুলি গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতার কাঠামো, ভূমি-সম্পর্ক এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। বাংলার ক্ষেত্রে নীলবিদ্রোহ, পাবনা কৃষক বিদ্রোহ, তেভাগা এবং পরবর্তী বর্গা আন্দোলন— প্রতিটি পর্যায়েই কৃষকরা ভূমি ও উৎপাদনের উপর নিজেদের অধিকারের প্রশ্নকে সামনে এনেছে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৬–৪৭-এর তেভাগা আন্দোলন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। ডি. এন. ধনাগারের বিশ্লেষণে তেভাগা ছিল ভাগচাষিদের এমন একটি সংগঠিত সংগ্রাম, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত অর্ধেক-অর্ধেক ফসল ভাগের পরিবর্তে চাষির হাতে দুই-তৃতীয়াংশ ফসল রাখা। তাঁর মতে, এটি ছিল রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত কৃষকসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহ। তেভাগার সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্রগুলি উত্তরবঙ্গে অবস্থিত হলেও আন্দোলনটি মেদিনীপুরসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। মেদিনীপুরের মহিষাদল, সুতাহাটা এবং নন্দীগ্রাম ছিল তেভাগার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। নন্দীগ্রামের ইতিহাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল— এই অঞ্চলে কৃষক সমাজের রাজনৈতিক সক্রিয়তা তেভাগার অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ, আইন অমান্য, লবণ সত্যাগ্রহ এবং ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেদিনীপুরের কৃষকসমাজের সক্রিয়তা ছিল উল্লেখযোগ্য। তেভাগা সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যেই নতুন কৃষি-অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আবির্ভূত হয়।

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমি : বাংলার ঔপনিবেশিক কৃষি-ব্যবস্থায় জমির মালিকানা ও চাষের অধিকার এক জিনিস ছিল না। বহুক্ষেত্রে জমির মালিক বা জোতদার নিজের জমি অন্য কৃষকের হাতে চাষের জন্য দিতেন। উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ চাষি এবং মালিকের মধ্যে ভাগ হত। এই ভাগচাষিরা বিভিন্ন অঞ্চলে বর্গাদার, আধিয়ার, ভাগচাষি প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। প্রচলিত ব্যবস্থায় উৎপাদিত ফসলের প্রায় অর্ধেক জমির মালিকের হাতে চলে যেত। সমস্যা শুধু ফসল ভাগে সীমাবদ্ধ ছিল না। কৃষকদের উপর নানা ধরনের বেআইনি আদায়, ঋণ, খাজনা এবং সামাজিক নির্ভরতার চাপ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মূল্যবৃদ্ধি এবং ১৯৪৩-এর ভয়াবহ বাংলার দুর্ভিক্ষ কৃষকসমাজের দুর্বলতাকে আরও প্রকট করে। কৃষিজীবী মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা এবং উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই পরিস্থিতিতে কৃষক সংগঠনগুলি ভাগচাষিদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ১৯৩০-এর দশক থেকেই তেভাগার দাবি কৃষক সভার কর্মসূচিতে স্থান পেতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে ১৯৩৯–৪০ সালের ফ্লাউড কমিশন বাংলার কৃষি-ব্যবস্থার নানা সমস্যার কথা তুলে ধরে এবং ভাগচাষিদের অবস্থার উন্নতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। অতএব, ১৯৪৬-এর তেভাগা হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে ছিল দীর্ঘদিনের কৃষি-সংকট, কৃষক সংগঠন এবং রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশ।

'তেভাগা' দাবির প্রকৃতি : 'তেভাগা' শব্দের অর্থ তিনভাগ। আন্দোলনের মূল দাবি ছিল— ফসলের তিন ভাগের মধ্যে দুই ভাগ থাকবে যে কৃষক জমিতে শ্রম ও উৎপাদনের প্রধান দায়িত্ব পালন করেছে তার কাছে এবং একভাগ যাবে জমির মালিকের কাছে। প্রচলিত অর্ধেক-অর্ধেক ভাগের বিরুদ্ধে এই দাবি কেন উঠেছিল? কৃষকদের যুক্তি ছিল, জমির মালিক জমি দিলেও চাষের বাস্তব শ্রম, বীজ, সার, পরিচর্যা, ফসল কাটা ইত্যাদিতে ভাগচাষির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে উৎপাদনের অধিকাংশ অংশ চাষির কাছে থাকা ন্যায়সংগত। কিন্তু তেভাগার দ্বিতীয় দাবি ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ— ফসল জোতদারের খামারে নয়, চাষির নিজের খামারে তোলা হবে।[১] এই দাবি অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রকে আঘাত করেছিল। কারণ ফসল জোতদারের খামারে গেলে ভাগ নির্ধারণ ও ফসলের উপর নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে জোতদারের হাতে চলে যেত। নিজের খামারে ফসল রাখা মানে চাষির উৎপাদনের উপর বাস্তব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। এই কারণে তেভাগা ছিল কেবল 'দুই-তৃতীয়াংশ ফসল চাই' আন্দোলন নয়। এটি ছিল উৎপাদনের উপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

রাজনৈতিক সংগঠন ও তেভাগার বিস্তার : তেভাগা আন্দোলনের সাংগঠনিক নেতৃত্বে ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা, যার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষক সভা ভাগচাষিদের তেভাগা দাবি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাস্তবায়নের জন্য গণআন্দোলনের আহ্বান জানায়। আন্দোলন উত্তরবঙ্গে বিশেষ শক্তিশালী হলেও দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলার বহু অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। মেদিনীপুর ছিল তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রামে তেভাগার সংগঠন গড়ে ওঠে। গবেষণায় মেদিনীপুরের এই অঞ্চলগুলিকে তেভাগার প্রধান কেন্দ্রগুলির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্দোলনের সময় ভাগচাষিরা ফসল নিজেদের খামারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। অনেক জায়গায় জোতদারদের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় এবং পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। ফলে অর্থনৈতিক দাবি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সংঘর্ষে রূপ নেয়। তবে আন্দোলনের চরিত্র সব অঞ্চলে একরকম ছিল না। কোথাও সংগঠিত কৃষক সভার নেতৃত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আবার কোথাও স্থানীয় কৃষকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনে যুক্ত হয়। এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্য তেভাগা আন্দোলনকে বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নন্দীগ্রামের কৃষকসমাজ ও তেভাগার পূর্ব-ইতিহাস : নন্দীগ্রামের তেভাগা আন্দোলনকে বুঝতে হলে তার পূর্ববর্তী কৃষক-প্রতিরোধের ইতিহাসের দিকে তাকানো প্রয়োজন। মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি শোষণ, অবৈধ আদায় এবং ঔপনিবেশিক রাজস্বনীতির বিরুদ্ধে কৃষকসমাজের প্রতিরোধের দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। সাম্প্রতিক গবেষণায় নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল ও ময়না অঞ্চলে ‘আবওয়াব’ বা অতিরিক্ত অবৈধ আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলি কৃষকদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তৈরি করেছিল। তারা বুঝতে শিখেছিল যে সংগঠিতভাবে দাবি উত্থাপন করা সম্ভব এবং স্থানীয় প্রশাসন ও জমিদারি ক্ষমতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৬ সালে তেভাগার দাবি নন্দীগ্রামে পৌঁছালে তা সম্পূর্ণ নতুন কোনও রাজনৈতিক ধারণা হিসেবে আবির্ভূত হয়নি। বরং আগের কৃষক-প্রতিরোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা নতুন অর্থনৈতিক দাবি ও শ্রেণি-চেতনার ভাষা গ্রহণ করে।

নন্দীগ্রামে তেভাগা আন্দোলনের বিস্তার : নন্দীগ্রাম ছিল মেদিনীপুরের তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। গবেষণামূলক সূত্রে দেখা যায়, ১৯৪৬ সালে নন্দীগ্রাম অঞ্চলে কৃষক সভার সংগঠন শক্তিশালী করার চেষ্টা হয়েছিল এবং ভাগচাষিদের মধ্যে তেভাগার দাবি প্রচারিত হয়। ভূপাল পাণ্ডা, অনন্ত মাঝি এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্মীদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁরা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করেন এবং তেভাগার দাবি বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ফসল নিজেদের খামারে তোলার প্রশ্নটি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কার্যকরী দিক হয়ে ওঠে। নন্দীগ্রামের কৃষকসমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল— এখানে কৃষি ছিল শুধু অর্থনৈতিক পেশা নয়, সামাজিক জীবন ও স্থানীয় পরিচয়ের মূল ভিত্তি। ফলে জমির উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো বা উৎপাদনের উপর অধিকার কমে যাওয়া কৃষকের কাছে সরাসরি জীবিকা ও সামাজিক অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াত। এই কারণেই তেভাগার অর্থনৈতিক দাবি নন্দীগ্রামে দ্রুত সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য লাভ করেছিল।

নন্দীগ্রামে তেভাগা আন্দোলনের বিস্তার : মেদিনীপুর জেলার তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসে নন্দীগ্রাম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো নন্দীগ্রামেও তেভাগা আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল ভাগচাষিদের উপর জোতদার ও জমির মালিকদের নিয়ন্ত্রণ, ফসলের অন্যায্য বণ্টন এবং কৃষকের উৎপাদনের উপর সীমিত অধিকার। কিন্তু নন্দীগ্রামের আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিল এর পূর্ববর্তী কৃষক-প্রতিরোধের ঐতিহ্য, স্থানীয় কৃষক নেতৃত্ব, নদী-খালবেষ্টিত ভৌগোলিক অবস্থান এবং নারীসমাজের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ। ফলে নন্দীগ্রামে তেভাগা কেবল একটি কৃষি-অর্থনৈতিক দাবি হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; ক্রমে তা একটি ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।

তেভাগার পূর্বপ্রস্তুতি : নন্দীগ্রামে তেভাগা আন্দোলনের সংগঠিত প্রস্তুতি ১৯৪৬ সালে হঠাৎ শুরু হয়নি। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময় থেকেই মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বামপন্থী কর্মীরা ত্রাণ, খাদ্যসংগ্রহ ও কৃষক সংগঠনের কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই সময় কৃষকদের মধ্যে খাদ্য, ফসল এবং জমির উপর অধিকারের প্রশ্ন নতুন গুরুত্ব লাভ করে। মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা গ্রামীণ মানুষের কাছে খাদ্যশস্যের উপর নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বকে অত্যন্ত তীব্র করে তোলে। নন্দীগ্রামের কৃষক সমাজের মধ্যে এর আগেও জমিদার ও জোতদারদের অবৈধ আদায় বা 'আবওয়াব'-এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছিল। ফলে কৃষকদের মধ্যে সংগঠিত প্রতিবাদের একটি সামাজিক ভিত্তি ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছিল। তেভাগা সেই পূর্ববর্তী অসন্তোষকে একটি সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিতে রূপান্তরিত করে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত পুরুষোত্তমপুরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগচাষি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রাদেশিক কৃষকসভার প্রতিনিধি অবনী লাহিড়ি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের আলোকে ভাগচাষিদের উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ তাঁদের নিজেদের কাছে রাখার দাবি উত্থাপিত হয়। একই সঙ্গে ফসল জোতদারের খামারে না রেখে ভাগচাষির নিজস্ব খামার বা গোলায় রাখার দাবিও সামনে আসে। এই সম্মেলন নন্দীগ্রামের তেভাগা আন্দোলনের সাংগঠনিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এর মাধ্যমে 'আধি নয়, তেভাগা চাই' স্লোগানটি স্থানীয় কৃষকসমাজের মধ্যে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দাবিতে পরিণত হতে শুরু করে।[২]

স্থানীয় নেতৃত্বের আবির্ভাব : নন্দীগ্রামে তেভাগা আন্দোলনের বিস্তারে স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূপাল পাণ্ডা, অনন্ত মাজি, পণ্ডিত জানা, বঙ্কিম গিরি, রাখাল মণ্ডল, চিত্ত গিরি, ব্যাহ্রিদেব আগস্তি, রজনী গুচ্ছাইত এবং পতিত জনার মতো স্থানীয় কৃষক-কর্মীরা সংগঠন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে ভূপাল পাণ্ডা ও অনন্ত মাজির নেতৃত্বে নন্দীগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করা হয়। তাঁরা গ্রামে গ্রামে সভা করেন, ভাগচাষিদের তেভাগার দাবি সম্পর্কে সচেতন করেন এবং জোতদারদের প্রচলিত ফসল-বণ্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে ভূপাল পাণ্ডা নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন।[৩] ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে তিনি নন্দীগ্রাম দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে বিধায়ক নির্বাচিত হন। এই তথ্যটি প্রমাণ করে যে তেভাগার সময় গড়ে ওঠা স্থানীয় কৃষক-নেতৃত্ব পরবর্তী নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

'আধি নয়, তেভাগা চাই' : নন্দীগ্রামে তেভাগা আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল— 'আধি নয়, তেভাগা চাই।' প্রচলিত ভাগচাষ ব্যবস্থায় উৎপাদিত ফসলের প্রায় অর্ধেক জমির মালিক বা জোতদারের হাতে চলে যেত। ভাগচাষিদের দাবি ছিল, তারা যেহেতু কৃষিকাজের অধিকাংশ শ্রম ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তাই তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ ফসল পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই দাবির সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি যুক্ত ছিল— ধান জোতদারের গোলা বা খামারে না তুলে ভাগচাষির নিজস্ব খামারে রাখা হবে। এই দ্বিতীয় দাবিটি আপাতদৃষ্টিতে প্রশাসনিক বা সংরক্ষণ সংক্রান্ত মনে হলেও এর মধ্যে ছিল গভীর ক্ষমতার প্রশ্ন। ফসল কোথায় থাকবে, তা নির্ধারণের অধিকার আসলে উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জোতদারের গোলায় ফসল গেলে ফসলের পরিমাণ নির্ধারণ, ভাগ বণ্টন এবং হিসাবের উপর জোতদারের প্রভাব বজায় থাকত। কিন্তু কৃষকের নিজের খামারে ফসল থাকলে উৎপাদনের উপর তার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পেত। তাই তেভাগার দাবি ছিল অর্থনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামো পরিবর্তনের দাবিও।

নন্দীগ্রাম থেকে সুতাহাটা ও মহিষাদলে বিস্তার : নন্দীগ্রামের তেভাগা আন্দোলন প্রশাসনিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা এবং মহিষাদল পরস্পর সংলগ্ন কৃষি-অর্থনৈতিক অঞ্চলের অংশ হওয়ায় আন্দোলনের প্রভাব দ্রুত পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা যায়, মেদিনীপুরে মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম ছিল তেভাগা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই অঞ্চলে কৃষকরা ফসল কাটার সময় জোতদারদের প্রচলিত ব্যবস্থা অমান্য করে নিজেদের খামারে ফসল তোলার উদ্যোগ নেন। ভূপাল পাণ্ডা, অনন্ত মাজি এবং অন্যান্য নেতারা এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। নন্দীগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থানও আন্দোলনের বিস্তারে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। হলদি নদী, হুগলি নদী

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এবং অসংখ্য খাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন নন্দীগ্রামের বহু অঞ্চল যোগাযোগের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে দুর্গম ছিল। এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আন্দোলনকারীদের সংগঠিত হওয়ার এবং অনেকক্ষেত্রে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগ বজায় রাখার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। নন্দীগ্রামের এই বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক চরিত্র পরবর্তী সময়েও স্থানীয় প্রতিরোধের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ফসল কাটার আন্দোলন : তেভাগা আন্দোলনের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ছিল ফসল কাটার প্রশ্ন। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ছিল— চাষি যে জমিতে শ্রম দিয়েছে এবং উৎপাদন করেছে, সেই ফসল প্রথমে তার নিজের খামারে তোলা হবে। এরপর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মালিকের অংশ দেওয়া হবে। নন্দীগ্রাম ও সংলগ্ন অঞ্চলে এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য কৃষকরা দলবদ্ধভাবে ধান কাটতে শুরু করেন। এর ফলে জোতদারদের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হয়। কারণ ফসল কাটা ও সংরক্ষণের নিয়ন্ত্রণ হারানো মানে জোতদারদের প্রচলিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দুর্বল হয়ে যাওয়া। কিছু অঞ্চলে কৃষকেরা জোতদারের খামারে থাকা ফসলের পরিবর্তে নিজেদের প্রাপ্য অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয় নেতৃত্বের সক্রিয়তায় এই কর্মসূচি আরও বিস্তৃত হয়। গবেষণায় নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা ও মহিষাদলে ফসল কেটে ভাগচাষিদের খামারে তোলার আন্দোলনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নারীদের অংশগ্রহণ ও বিমলা মাজি : নন্দীগ্রামের তেভাগা আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির একটি ছিল নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। এইক্ষেত্রে বিমলা মাজির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিমলা মাজিকে নন্দীগ্রাম অঞ্চলে নারীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।[৪] প্রথমদিকে গ্রামীণ নারীদের একটি বড় অংশ প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভায় অংশ নিতে দ্বিধা করতেন। সামাজিক রক্ষণশীলতা, পর্দা এবং প্রচলিত লিঙ্গভূমিকার কারণে তাঁদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত ছিল। কিন্তু বিমলা মাজি ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। নন্দীগ্রামের রানিচক এলাকায় নারীদের ঘরোয়া সভার মাধ্যমে তাঁর সংগঠনমূলক কাজ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে কেন্দামারি-জলপাইসহ বিভিন্ন এলাকায় নারীদের সভায় অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। একটি সভায় প্রায় ৬০ জন নারী উপস্থিত ছিলেন; পরবর্তী সভায় উপস্থিতি প্রায় ১০০ জনে পৌঁছেছিল বলে সমকালীন স্মৃতিচারণ ও পরবর্তী গবেষণায় উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] এই অংশগ্রহণ কেবল সভা বা মিছিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কৃষিকাজের ক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণের নতুন মাত্রা তৈরি হয়। নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা ও মহিষাদলের গ্রামীণ সমাজে সাধারণত পুরুষরা মাঠের চাষ ও ধান কাটার কাজে প্রধান ভূমিকা নিতেন এবং নারীরা তুলনামূলকভাবে গৃহস্থালি ও ফসল-পরবর্তী কাজে যুক্ত থাকতেন। বিমলা মাজির সংগঠনের ফলে নারীরা সরাসরি ধান কাটা ও ফসল নিজেদের খামারে তোলার কাজে অংশ নিতে শুরু করেন। এই পরিবর্তনকে শুধু তেভাগা আন্দোলনের সাংগঠনিক কৌশল হিসেবে দেখলে তার সামাজিক গুরুত্ব কমিয়ে দেখা হবে। বাস্তবে এটি গ্রামীণ নারীর শ্রম ও রাজনৈতিক পরিচয়ের একটি নতুন স্বীকৃতি তৈরি করেছিল।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও নারীর সংগঠন : বিমলা মাজির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তেভাগার সময় থেকেই শুরু হয়নি। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময় তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ত্রাণকাজ, খাদ্য সংগ্রহ, নারীদের সংগঠন এবং সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ নারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি করেন। এই পূর্ববর্তী সংগঠনমূলক অভিজ্ঞতা তেভাগার সময় অত্যন্ত কার্যকর হয়ে ওঠে। নারীরা বুঝতে শুরু করেন যে ফসলের উপর অধিকার কেবল পুরুষ কৃষকের প্রশ্ন নয়; পরিবারের খাদ্যনিরাপত্তার সঙ্গে এটি সরাসরি যুক্ত। তেভাগার একটি মৌলিক দাবি— ফসল চাষির নিজের খামারে রাখা—গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছিল। কারণ মন্বন্তরের অভিজ্ঞতায় তাঁরা খাদ্যশস্যের অভাব এবং খাদ্যের অনিশ্চয়তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিজের পরিবারের কাছে ধান থাকা তাঁদের কাছে নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নন্দীগ্রামে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ : নন্দীগ্রামের তেভাগা আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল হিন্দু ও মুসলিম কৃষকসমাজের যৌথ অংশগ্রহণ। স্থানীয় গবেষণা ও মৌখিক ইতিহাসে মুসলিম নারীদেরও আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি গবেষণায় মেদিনীপুরের কিছু অঞ্চলে একটি গ্রাম থেকেই ১০০–১৫০ জন মুসলিম নারীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে এবং নন্দীগ্রামে সামাজিক সংকোচ কাটিয়ে মুসলিম নারীদের আন্দোলনে যুক্ত করার ক্ষেত্রে বিমলা মাজির ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ১৯৪৬–৪৭ ছিল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দেশভাগের পূর্ববর্তী অস্থিরতার সময়। সেই প্রেক্ষাপটে কৃষক পরিচয়ের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিমের যৌথ অংশগ্রহণ তেভাগা আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে কৃষকের অর্থনৈতিক স্বার্থ অনেকক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের বিভাজনকে অতিক্রম করে একটি যৌথ কৃষক-পরিচয় তৈরি করেছিল।

পুলিশি দমন ও আন্দোলনের তীব্রতা : আন্দোলনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের নজরদারি ও পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। নন্দীগ্রামে তেভাগা ঠেকানোর জন্য একাধিক পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি প্রতিবেদনে নন্দীগ্রামেই সাতটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। পুলিশি দমন আন্দোলনকে আরও সংঘাতপূর্ণ করে তোলে। কৃষক নেতাদের গ্রেফতার করা হয় এবং বহুকর্মীকে আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হতে হয়। বিমলা মাজিকেও পুলিশ খুঁজতে থাকে। তিনি বিভিন্ন সময়ে আত্মগোপন করে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যান। পরবর্তীতে নীলকুণ্ঠা গ্রামে এক জেলের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর স্বামী অনন্ত মাজিও গ্রেফতার হন এবং দু'জনেই দীর্ঘ সময় কারাবন্দি ছিলেন। এখানে দেখা যায়, তেভাগার আন্দোলন যত বিস্তৃত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় দমনও তত শক্তিশালী হয়েছে। ফলে আন্দোলনটি ক্রমে শুধু ফসলের ভাগের অর্থনৈতিক প্রশ্নে সীমাবদ্ধ না থেকে রাষ্ট্র, পুলিশ ও স্থানীয় ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাতের রূপ নেয়।

'সংগ্রাম অঞ্চল' ও স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ : তেভাগা আন্দোলনের কিছু অঞ্চলে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কার্যত দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং আন্দোলনকারীরা নিজেদের সংগঠিত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। এই ধরনের এলাকাকে কোথাও কোথাও 'সংগ্রাম অঞ্চল' বা 'মুক্তাঞ্চল' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা ও মহিষাদলের কিছু এলাকায় এই ধরনের পরিস্থিতির উল্লেখ গবেষণায় পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে সম্পূর্ণ নন্দীগ্রাম দীর্ঘ সময় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। বরং নির্দিষ্ট কিছু গ্রামীণ এলাকায় কৃষক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবক দল এবং স্থানীয় জনগণের সম্মিলিত শক্তি প্রশাসনিক কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।[৬] নন্দীগ্রামের ইতিহাসে এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ। গবেষণায় দেখা যায়, নন্দীগ্রামের কৃষক-প্রতিরোধের ঐতিহ্যে রাস্তা কেটে দেওয়া, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো কৌশলের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

নদী ও ভূগোলের ভূমিকা : নন্দীগ্রামের তেভাগা আন্দোলন বিশ্লেষণে ভূগোলকে উপেক্ষা করা যায় না। হলদি নদী, হুগলি নদী এবং খালবেষ্টিত এই অঞ্চলের বহু গ্রাম ঐতিহাসিকভাবে যোগাযোগের দিক থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিল। এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য একদিকে প্রশাসনিক নজরদারিকে কঠিন করেছিল, অন্যদিকে গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও সংগঠনকে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র দিয়েছিল। নদীপথও কৃষি ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ফলে ফসলের উৎপাদন, পরিবহণ এবং বাজারজাতকরণের প্রশ্ন নন্দীগ্রামের কৃষকজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ভৌগোলিক বাস্তবতা তেভাগার মতো কৃষক আন্দোলনের বিস্তারে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছিল। আন্দোলনকারীরা গ্রামের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের উপর নির্ভর করতে পেরেছিলেন এবং পুলিশি নজরদারি এড়িয়ে বিভিন্ন এলাকায় যোগাযোগ বজায় রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আন্দোলনের সামাজিক তাৎপর্য : নন্দীগ্রামের তেভাগা আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এর সামাজিক বিস্তার। এটি শুধু ভাগচাষিদের দাবি ছিল না; ধীরে ধীরে কৃষক, কৃষিশ্রমিক, দরিদ্র গ্রামীণ নারী এবং অন্যান্য নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। বিশেষত নারীদের অংশগ্রহণ আন্দোলনের সামাজিক চরিত্রকে পরিবর্তন করে। যাঁরা আগে কৃষিক্ষেত্রে প্রধানত সহায়ক ভূমিকা পালন করতেন, তাঁরা সরাসরি ফসল কাটা, সভা, প্রচার এবং প্রতিরোধের কাজে যুক্ত হন। ফলে তেভাগা গ্রামীণ সমাজের প্রচলিত লিঙ্গভূমিকাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। বিমলা মাজির কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীরা অর্থনৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকারকে একই সঙ্গে দেখতে শেখেন। গবেষণায় তাঁর নেতৃত্বে নন্দীগ্রামের নারীদের সংগঠিত হওয়ার এবং কৃষি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নন্দীগ্রামের তেভাগা : একটি আঞ্চলিক মূল্যায়ন— সামগ্রিকভাবে নন্দীগ্রামের তেভাগা আন্দোলনকে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়।প্রথমত, এটি ছিল অর্থনৈতিক আন্দোলন— ভাগচাষির উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য অংশের দাবি। দ্বিতীয়ত, এটি ছিল সামাজিক আন্দোলন— যেখানে নারী, দরিদ্র কৃষক এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যুক্ত হয়েছিল। তৃতীয়ত, এটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন— যেখানে কৃষকসমাজ স্থানীয় জোতদারি ক্ষমতা এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। এই তিনটি মাত্রার সমন্বয়ই নন্দীগ্রামের তেভাগাকে মেদিনীপুরের কৃষক-আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। ১৯৪৬–৪৭-এর আন্দোলন শেষপর্যন্ত তার সমস্ত দাবি তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত করতে পারেনি। কিন্তু আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে যে অধিকারচেতনা তৈরি করেছিল, তা পরবর্তী কয়েক দশক ধরে টিকে থাকে। নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভূপাল পাণ্ডার মতো তেভাগা-নেতার পরবর্তী ভূমিকা এবং ভূমি ও কৃষক-অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনের ধারাবাহিকতা সেই দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে। অতএব, নন্দীগ্রামে তেভাগার বিস্তারকে কেবল ১৯৪৬–৪৭ সালের একটি কৃষক আন্দোলনের আঞ্চলিক পর্ব হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়। এটি ছিল দীর্ঘদিনের কৃষক-অসন্তোষ, মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা, স্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠন, ভূমির সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক এবং নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের একটি ঐতিহাসিক প্রকাশ। এই কারণেই পরবর্তী সময়ে নন্দীগ্রাম যখন আবার ভূমি-অধিকার ও উচ্ছেদের প্রশ্নে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে উঠে আসে, তখন তার পূর্ববর্তী কৃষক-প্রতিরোধের ইতিহাস নতুন তাৎপর্য লাভ করে।[৭]

তেভাগা আন্দোলনের শ্রেণিচরিত্র : তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এর শ্রেণিগত চরিত্র। আন্দোলনের মূল সংঘাত ছিল ভাগচাষি ও জোতদার বা জমির নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণির মধ্যে। তবে বাংলার গ্রামীণ সমাজ সরল দ্বি-মেরু ছিল না। গ্রামে ছোট কৃষক, মাঝারি কৃষক, ভাগচাষি, কৃষিশ্রমিক এবং তুলনামূলক সচ্ছল কৃষক— বিভিন্ন স্তর ছিল। ফলে তেভাগার প্রভাবও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর উপর ভিন্নভাবে পড়েছিল। কমিউনিস্ট নেতৃত্ব তেভাগাকে শ্রেণিসংগ্রামের ভাষায় ব্যাখ্যা করলেও স্থানীয় কৃষকদের কাছে এটি অনেকসময় ছিল জীবিকা, ন্যায্য ভাগ এবং সামাজিক সম্মানের প্রশ্ন। এই দুই মাত্রার সমন্বয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল। ডি. এন. ধনাগারের বিশ্লেষণেও তেভাগাকে একটি রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত কৃষক-বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রাষ্ট্র, পুলিশ ও আন্দোলন : তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক দমনও বৃদ্ধি পায়। জোতদারদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অনেক জায়গায় কৃষকদের দমন করে। গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ এবং সংঘর্ষ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা যায়। এখানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈত চরিত্র দেখা যায়। একদিকে কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে সরকারি কমিশন ও প্রশাসনিক নথিতে স্বীকৃতি ছিল; অন্যদিকে বাস্তবে যখন কৃষকরা সেই সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য গণআন্দোলনে নামল, তখন প্রশাসন আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে তাদের দমন করতে এগিয়ে আসে। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে বঙ্গীয় বর্গাদারদের নিয়ে অস্থায়ী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দেশভাগ এবং প্রশাসনিক পরিবর্তনের ফলে তেভাগার দাবির পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেনি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তেভাগা আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও সাফল্য : তেভাগা আন্দোলন তাৎক্ষণিকভাবে সর্বত্র আইনগতভাবে দুই-তৃতীয়াংশ ভাগচাষির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। রাজনৈতিক অস্থিরতা, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং প্রশাসনিক দমন আন্দোলনের ধারাকে দুর্বল করে। তবুও আন্দোলনকে ব্যর্থ বলা যায় না। কারণ এর মাধ্যমে বাংলার কৃষি-রাজনীতিতে বর্গাদারের অধিকার একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্নে পরিণত হয়। কিছু অঞ্চলে ভাগচাষিরা বাস্তবে তেভাগার অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং বেআইনি আদায়ের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, তেভাগা পরবর্তী ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী সময়ে বর্গাদার নথিভুক্তিকরণ ও 'অপারেশন বর্গা'-র মতো কর্মসূচির সঙ্গে তেভাগার ঐতিহাসিক সম্পর্ক নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। অর্থাৎ তেভাগার সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল কৃষকের অধিকারকে বাংলার রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা।[৮]

তেভাগার ঐতিহাসিক স্মৃতি ও নন্দীগ্রাম : নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে তেভাগার একটি বিশেষ উত্তরাধিকার হল 'ভূমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক'-এর রাজনৈতিক স্মৃতি। ২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল শিল্প ও রাসায়নিক হাবের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব। এই আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি ছিল কৃষক, ভাগচাষি, কৃষিশ্রমিক এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। গবেষণায় নন্দীগ্রামের মানুষের কৃষিজমি, পুকুর, মৎস্যসম্পদ এবং বসতভূমির সঙ্গে গভীর অর্থনৈতিক ও আবেগগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তেভাগার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া যায়— দুইক্ষেত্রেই ভূমি কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ নয়; এটি ছিল মানুষের জীবনযাপন, সামাজিক সম্পর্ক ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ভিত্তি। তবে দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। তেভাগা ছিল মূলত বর্গাচাষির উৎপাদিত ফসলের ভাগ এবং কৃষি-সম্পর্কের কাঠামো নিয়ে সংগ্রাম। ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম ছিল ভূমি অধিগ্রহণ, শিল্পায়ন এবং উচ্ছেদের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আন্দোলন। ফলে দুই আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এক নয়। এই পার্থক্য বজায় রেখেই বলা যায় যে নন্দীগ্রামের দীর্ঘ কৃষক-প্রতিরোধের ইতিহাস ২০০৭-এর আন্দোলনের সামাজিক স্মৃতি ও রাজনৈতিক কল্পনাকে প্রভাবিত করেছিল।

তেভাগা থেকে ২০০৭ : ধারাবাহিকতা না ঐতিহাসিক স্মৃতি? - নন্দীগ্রামের কৃষক-আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গেলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে— ১৯৪৬–৪৭ সালের তেভাগা আন্দোলন এবং ২০০৭ সালের নন্দীগ্রামের ভূমি-আন্দোলনের মধ্যে কি সরাসরি কোনো ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ছিল, নাকি তেভাগা কেবল স্থানীয় কৃষক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে পরবর্তী আন্দোলনের মানসিক ও সামাজিক পটভূমিকে প্রভাবিত করেছিল? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দুই আন্দোলনের মধ্যে প্রায় ছয় দশকের ব্যবধান রয়েছে এবং উভয়ের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণও এক নয়। তেভাগার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ছিল ভাগচাষির উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য অংশ ও ফসলের উপর চাষির নিয়ন্ত্রণ; অন্যদিকে ২০০৭-এর আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ছিল কৃষিজমি অধিগ্রহণ এবং শিল্পায়নের জন্য কৃষকের জমি হারানোর আশঙ্কা। ফলে দুটি আন্দোলনকে সরাসরি একই রাজনৈতিক ধারার অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা যেমন অতিসরলীকরণ হবে, তেমনই তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই বলাও ঐতিহাসিকভাবে যথার্থ নয়। বরং নন্দীগ্রামের ইতিহাসকে দীর্ঘকালীন কৃষক-প্রতিরোধ, ভূমির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক এবং স্থানীয় রাজনৈতিক স্মৃতির ধারাবাহিকতায় দেখলে তেভাগা ও ২০০৭-এর আন্দোলনের মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র উপলব্ধি করা যায়। সাম্প্রতিক গবেষণায়ও নন্দীগ্রামের ২০০৭-এর আন্দোলন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পূর্ববর্তী কৃষক-প্রতিরোধের ইতিহাস, ভূমি সংস্কারের অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় মানুষের ভূমির সঙ্গে গভীর সম্পর্ককে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দুটি আন্দোলনের পৃথক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : প্রথমেই দুটি আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ১৯৪৬–৪৭-এর তেভাগা আন্দোলন ছিল ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি-সম্পর্কের সংকট থেকে উদ্ভূত। ভাগচাষিরা প্রচলিত ফসল ভাগের ব্যবস্থায় নিজেদের শ্রমের তুলনায় কম অংশ পাওয়ার প্রতিবাদ করেছিল। তাদের দাবি ছিল উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের কাছে রাখা এবং ফসল নিজেদের খামারে সংরক্ষণ করা। অন্যদিকে ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আন্দোলনের পটভূমি ছিল স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন ও ভূমি অধিগ্রহণের নীতি। নন্দীগ্রামে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা রাসায়নিক শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা সামনে আসার পর স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়। গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৬ সালের শেষদিকে অধিগ্রহণের প্রস্তাব এবং ২০০৭ সালের শুরুতে তার বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

অতএব, তেভাগার প্রশ্ন ছিল মূলত "উৎপাদিত ফসলের উপর কার অধিকার?", আর ২০০৭-এর প্রশ্ন ছিল "কৃষিজমির উপর কার সিদ্ধান্তের অধিকার?" প্রথমটি উৎপাদন-সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিল; দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছিল।

'ফসলের অধিকার' থেকে 'জমির অধিকার' : দুটি আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগত যোগসূত্র পাওয়া যায় অধিকার ধারণাটির মধ্যে। তেভাগার সময় ভাগচাষিরা বলেছিল, জমিতে শ্রম ও উৎপাদনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলে ফসলের উপর তাদের অধিকতর অধিকার থাকা উচিত। অর্থাৎ জমির মালিকানা এবং উৎপাদনের অধিকারকে এক করে দেখা যায় না। ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামের কৃষকদের প্রশ্নটি ছিল কিছুটা ভিন্ন। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, জমি অধিগ্রহণ হলে তাঁদের কৃষিজীবন, জীবিকা এবং সামাজিক অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। অর্থাৎ এখানে জমির মালিকানা শুধু একটি আইনি সম্পত্তির প্রশ্ন ছিল না; জমি ছিল জীবনযাত্রার ভিত্তি।

এই জায়গাতেই তেভাগা ও নন্দীগ্রামের মধ্যে একটি গভীর ঐতিহাসিক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই কৃষকের কাছে জমি কেবল বাজারে কেনাবেচার বস্তু নয়; জমি শ্রম, পরিবার, খাদ্য, সামাজিক সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত। Sayoni Bose-এর গবেষণায় এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তিনি নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে 'attachment to place' বা স্থানের সঙ্গে মানুষের গভীর সামাজিক সম্পর্কের ধারণাকে সামনে এনেছেন। তাঁর মতে, জমি এখানে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্পত্তি নয়; জমি একটি সামাজিক সম্পর্কের অংশ। অধিগ্রহণের আশঙ্কা সেই সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ভয় তৈরি করেছিল এবং তা প্রতিরোধকে তীব্র করেছিল।

তেভাগার স্থানীয় স্মৃতি ও নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক চেতনা : নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে তেভাগার গুরুত্বের একটি প্রধান দিক হলো স্থানীয় ঐতিহাসিক স্মৃতি। কোনো একটি অঞ্চলে সংঘটিত পুরনো আন্দোলন পরবর্তী প্রজন্মের রাজনৈতিক আচরণকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ না করলেও একটি প্রতিরোধের স্মৃতি তৈরি করতে পারে। সেই স্মৃতি স্থানীয় মানুষের মধ্যে একটি ধারণা তৈরি করে যে, অন্যায় বা বাইরের চাপের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ করা সম্ভব। নন্দীগ্রামের ইতিহাসে ঔপনিবেশিক-বিরোধী আন্দোলন, জমিদার-বিরোধী কৃষক-প্রতিরোধ এবং তেভাগা— সবমিলিয়ে একটি দীর্ঘ প্রতিরোধের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল। ২০০৭-এর আন্দোলন নিয়ে গবেষণায় এই পূর্ববর্তী ইতিহাসকে স্থানীয় প্রতিরোধের মানসিক পটভূমির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই কারণে তেভাগাকে ২০০৭-এর আন্দোলনের সরাসরি কারণ বলা যাবে না। কিন্তু তেভাগার স্মৃতি নন্দীগ্রামের কৃষক সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক স্মৃতি এখানে প্রত্যক্ষ কারণ নয়, বরং পরোক্ষ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পদ।

ভূমি সংস্কার ও 'অধিকার'-এর নতুন অর্থ : তেভাগা আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বুঝতে গেলে স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কারের দিকে তাকাতে হয়। বিশেষত ১৯৭৭-এর পর বর্গাদার নথিভুক্তিকরণ এবং অপারেশন বর্গার মাধ্যমে ভাগচাষিদের অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। নন্দীগ্রামের কৃষকদের মধ্যে এর প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বহু কৃষক প্রথমবারের মতো নিজেদের চাষের জমির উপর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অধিকার ও স্বীকৃতি লাভ করেন। ফলে কয়েক দশক ধরে জমি তাঁদের কাছে শুধু জীবিকার মাধ্যম নয়, একটি অর্জিত অধিকার হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়। Bose-এর গবেষণা দেখিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কারের অভিজ্ঞতা নন্দীগ্রামের কৃষকদের ভূমির সঙ্গে সম্পর্ককে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শক্তিশালী করেছিল। অর্থাৎ ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে যে কৃষক-অধিকার তৈরি হয়েছিল, ২০০৭-এর অধিগ্রহণের আশঙ্কা সেই অর্জিত নিরাপত্তার উপর আঘাত হিসেবে অনুভূত হতে পারে। এখানে একটি ঐতিহাসিক বৈপরীত্য দেখা যায়। যে রাজনৈতিক শক্তি দীর্ঘদিন কৃষক ও বর্গাদারের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজে শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছিল, পরবর্তী সময়ে সেই একই রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিল্পায়নমূলক ভূমি-নীতির বিরুদ্ধে কৃষকদের একাংশ দাঁড়ায়। ফলে ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে বুঝতে গেলে তেভাগা থেকে ভূমি সংস্কার এবং ভূমি সংস্কার থেকে ভূমি-অধিগ্রহণ-বিরোধী আন্দোলনের দীর্ঘ পথটি বিবেচনা করা জরুরি।

‘অধিকারপ্রাপ্ত কৃষক’ থেকে ‘ভূমি রক্ষাকারী কৃষক’ : তেভাগা ও পরবর্তী ভূমি সংস্কারের ফলে কৃষকের রাজনৈতিক পরিচয়ে একটি পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৬-এর ভাগচাষি মূলত জমির মালিকের কাছ থেকে অধিকতর উৎপাদন-অধিকার দাবি করছিল। কিন্তু কয়েক দশক পরে নন্দীগ্রামের কৃষক নিজেকে কেবল ভাগচাষি হিসেবে নয়, একটি নির্দিষ্ট ভূমির অধিকারী, ব্যবহারকারী এবং রক্ষক হিসেবেও দেখতে শুরু করে। ফলে ২০০৭-এর আন্দোলনে ‘কৃষক’ পরিচয়ের সঙ্গে ‘ভূমিরক্ষক’ পরিচয় যুক্ত হয়। এই পরিবর্তনটি গুরুত্বপূর্ণ। তেভাগার মূল প্রশ্ন ছিল উৎপাদনের বণ্টন; ২০০৭-এর মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদনের ভিত্তি—অর্থাৎ জমি—রক্ষা করা। তাই দুটি আন্দোলনের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি ধারণাগত রূপান্তর দেখা যায়—
তেভাগা → উৎপাদনের ন্যায্য অংশ → বর্গাদারের অধিকার → ভূমি সংস্কার → জমির উপর নিরাপত্তা → ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।
এটি সরল রাজনৈতিক কারণ-ফল সম্পর্ক নয়; বরং কৃষক-অধিকার ধারণার দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তন।

২০০৭-এর ‘মুক্তাঞ্চল’ এবং তেভাগার স্মৃতি : ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ‘মুক্তাঞ্চল’ বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে সংগঠিতভাবে রক্ষা করার প্রচেষ্টা। গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে স্থানীয় মানুষ রাস্তা কেটে, সেতু ও যোগাযোগব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করে এবং প্রবেশপথে পাহারা দিয়ে নিজেদের এলাকা রক্ষার চেষ্টা করেছিল। এই প্রতিরোধকে গবেষকরা ‘territorialization’ বা ভূখণ্ডকে রাজনৈতিক প্রতিরোধের ক্ষেত্র হিসেবে নির্মাণের প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই ঘটনাটির সঙ্গে নন্দীগ্রামের পূর্ববর্তী প্রতিরোধের একটি আকর্ষণীয় সম্পর্ক রয়েছে। Bose-এর গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে নন্দীগ্রামের পুরনো কৃষক-আন্দোলনেও রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভূখণ্ডকে প্রতিরোধের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করার নজির ছিল। অর্থাৎ ২০০৭-এর কিছু প্রতিরোধ-কৌশল স্থানীয় রাজনৈতিক স্মৃতিতে থাকা পুরনো প্রতিরোধের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করেছিল। এখানে তেভাগার সঙ্গে সম্পর্কটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তেভাগার সময় নন্দীগ্রামের কিছু অঞ্চল কৃষক-প্রতিরোধের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং ‘মুক্তাঞ্চল’-সদৃশ রাজনৈতিক কল্পনা তৈরি হয়েছিল। ২০০৭ সালে আবার নন্দীগ্রামের ভূখণ্ডকে বাইরের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রক্ষার ধারণা সামনে আসে। তবে এই সাদৃশ্যকে সরাসরি সাংগঠনিক উত্তরাধিকার বলা ঠিক হবে না। বরং বলা যায়, একটি অঞ্চলের পূর্ববর্তী প্রতিরোধের অভিজ্ঞতা পরবর্তী আন্দোলনের কল্পনা ও কৌশলের সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিণত হয়েছিল।

সংগঠনগত ধারাবাহিকতা বনাম সামাজিক ধারাবাহিকতা : তেভাগা থেকে ২০০৭-এর মধ্যে সরাসরি সংগঠনগত ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ১৯৪৬-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা এবং কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন কাঠামো এবং ২০০৭-এর ভূমি-উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সংগঠন এক ছিল না। ২০০৭-এর আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন একত্রিত হয়ে ভূমি-উচ্ছেদ প্রতিরোধের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিল। গবেষণায় BUPC বা Bhoomi Uchched Pratirodh Committee-কে বহু সংগঠনের সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তাই সংগঠনগত ধারাবাহিকতা সীমিত, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী। অর্থাৎ একই সংগঠন ১৯৪৬ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যায়নি; কিন্তু কৃষকসমাজ, ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক, স্থানীয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজনৈতিক স্মৃতি এবং প্রতিরোধের সংস্কৃতির কিছু উপাদান দীর্ঘ সময় ধরে টিকে ছিল। এই পার্থক্যটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'বাইরের হস্তক্ষেপ'-এর ধারণা : দুটি আন্দোলনের মধ্যে আরেকটি সাদৃশ্য হল বাইরের ক্ষমতার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষকের প্রতিরোধ। তেভাগার সময় কৃষকের উৎপাদন ও ফসলের উপর জোতদারি নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রধান সমস্যা। জোতদার কৃষকের উৎপাদন থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করত এবং ফসলের সংরক্ষণ ও বণ্টনের উপর প্রভাব রাখত। ২০০৭ সালে কৃষকের আশঙ্কা ছিল অন্যধরনের— রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাঁদের কৃষিজমি বৃহৎ শিল্প প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হতে পারে। দুটিক্ষেত্রেই স্থানীয় কৃষক মনে করেছিল যে তার জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সম্পদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তার অংশগ্রহণ ছাড়াই। তবে এখানে আবার পার্থক্যটি মনে রাখা জরুরি। তেভাগার ক্ষেত্রে বিরোধ ছিল গ্রামীণ উৎপাদন-সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বিরুদ্ধে; ২০০৭ সালে বিরোধটি ছিল রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন প্রকল্প ও ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। ফলে একই ধরনের 'বাইরের হস্তক্ষেপ' ধারণা থাকলেও তার রাজনৈতিক অর্থ এক নয়।

শিল্পায়নের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও নন্দীগ্রামের সন্দেহ : ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে শুধু তেভাগার স্মৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। নন্দীগ্রামের শিল্পায়নের পূর্ব অভিজ্ঞতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নন্দীগ্রাম হলদিয়ার কাছাকাছি হওয়ায় শিল্পাঞ্চলের বিস্তার সম্পর্কে স্থানীয় মানুষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। গবেষণায় ১৯৭০-এর দশকে জেলিংহাম অঞ্চলে শিল্প প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং পরবর্তী সময়ে প্রকল্প ব্যর্থতার স্মৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব অভিজ্ঞতা স্থানীয় মানুষের মধ্যে বৃহৎ শিল্প প্রকল্প সম্পর্কে সংশয় তৈরি করেছিল। অর্থাৎ ২০০৭-এর আন্দোলনের পেছনে অন্তত তিনটি ঐতিহাসিক স্তর কাজ করেছিল—

১. তেভাগা ও পূর্ববর্তী কৃষক-প্রতিরোধের স্মৃতি;
২. ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে অর্জিত জমির অধিকার ও নিরাপত্তা;
৩. শিল্পায়নের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও জমি হারানোর আশঙ্কা।

এই তিনটি স্তরের মিলিত প্রভাবে ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল।

'তেভাগার উত্তরাধিকার'—কতটা গ্রহণযোগ্য? - তাহলে কি ২০০৭-এর নন্দীগ্রামকে তেভাগার উত্তরাধিকার বলা যায়? একটি সীমিত অর্থে বলা যায়। তেভাগা নন্দীগ্রামের কৃষকসমাজে ভূমি ও কৃষক-অধিকারের একটি রাজনৈতিক ঐতিহ্য তৈরি করেছিল। সেই ঐতিহ্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানীয় ইতিহাস ও স্মৃতির অংশ হয়ে থাকতে পারে। নন্দীগ্রামের পূর্ববর্তী কৃষক-আন্দোলনের ইতিহাস যে ২০০৭-এর প্রতিরোধের রাজনৈতিক কল্পনায় ভূমিকা রেখেছিল, গবেষণাতেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু '২০০৭-এর আন্দোলন সরাসরি তেভাগার উত্তরাধিকার'—এই বক্তব্যটি অতিরঞ্জিত। কারণ-

- তেভাগার দাবি ও ২০০৭-এর দাবি এক ছিল না;
- দুটি আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এক ছিল না;
- দুটি আন্দোলনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এক ছিল না;
- তেভাগা ছিল প্রধানত ভাগচাষির ফসলের অধিকারকেন্দ্রিক;
- ২০০৭-এর আন্দোলন ছিল জমি অধিগ্রহণ ও কৃষিজীবন রক্ষাকেন্দ্রিক।

সুতরাং উত্তরাধিকার ছিল মূলত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্মৃতিগত; সরাসরি সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক নয়।

ঐতিহাসিক স্মৃতির রাজনৈতিক ব্যবহার : ঐতিহাসিক স্মৃতি নিজে কোনো আন্দোলন সৃষ্টি করে না; কিন্তু যখন বর্তমান সংকটের সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তখন সেই স্মৃতি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে ২০০৭ সালে জমি রক্ষার প্রশ্ন সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষের কাছে পূর্ববর্তী কৃষক-প্রতিরোধের ইতিহাস নতুন অর্থ লাভ করে। 'আমরা আগেও জমি ও অধিকার রক্ষার জন্য লড়েছি' — এই ধরনের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় একটি আন্দোলনের নৈতিক শক্তি বাড়াতে পারে। Bose-এর বিশ্লেষণে নন্দীগ্রামের পূর্ববর্তী প্রতিরোধের ইতিহাসকে ২০০৭-এর আন্দোলনে স্থানীয় ভূখণ্ডকে সংগঠিতভাবে রক্ষার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিতে ইতিহাস এখানে কেবল অতীতের বর্ণনা নয়; ইতিহাস একটি political resource বা রাজনৈতিক সম্পদে পরিণত হয়।

তেভাগা ও ২০০৭ : তুলনামূলক বিশ্লেষণ—

বিষয়	**তেভাগা, ১৯৪৬–৪৭**	**নন্দীগ্রাম, ২০০৭**
প্রধান প্রশ্ন	ফসলের ন্যায্য ভাগ	কৃষিজমি রক্ষা
প্রধান সামাজিক গোষ্ঠী	ভাগচাষি/ কৃষক	কৃষক, ভূমি-নির্ভর গ্রামীণ জনগোষ্ঠী
প্রধান প্রতিপক্ষ	জোতদার/ জমির নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণি ও ঔপনিবেশিক প্রশাসন	ভূমি অধিগ্রহণের রাষ্ট্রীয় নীতি ও তার বাস্তবায়ন
মূল দাবি	ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ চাষির	জমি অধিগ্রহণ বন্ধ
ভূমির অর্থ	উৎপাদনের ভিত্তি	জীবিকা, সামাজিক অস্তিত্ব ও স্থানিক পরিচয়
আন্দোলনের চরিত্র	কৃষি-অর্থনৈতিক ও শ্রেণিভিত্তিক	ভূমি-অধিকার, রাজনৈতিক ও সামাজিক
নারী অংশগ্রহণ	গুরুত্বপূর্ণ	গুরুত্বপূর্ণ
ঐতিহাসিক তাৎপর্য	বর্গাদার অধিকারের ভিত্তি শক্তিশালী করা	ভূমি অধিগ্রহণের রাজনীতিকে জাতীয় আলোচনায় আনা

এই তুলনা থেকে স্পষ্ট হয় যে দুটি আন্দোলনের দাবি পৃথক হলেও ভূমির সঙ্গে কৃষকের সম্পর্কের প্রশ্নে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে।[৯]

ধারাবাহিকতার একটি নতুন ধারণা : তেভাগা থেকে ২০০৭-এর সম্পর্ককে যদি সরল 'A আন্দোলন → B আন্দোলন' হিসেবে দেখা হয়, তাহলে ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ স্তর বাদ পড়ে যাবে। বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি কৃষক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা অধিক কার্যকর।

এই প্রক্রিয়াটিকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায়—

তেভাগা আন্দোলন
↓
ভাগচাষির অধিকারচেতনা
↓
ভূমি সংস্কার ও বর্গাদার নিরাপত্তা
↓
জমির সঙ্গে কৃষকের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক সম্পর্ক
↓
শিল্পায়ন ও ভূমি অধিগ্রহণের নতুন চাপ
↓
জমি রক্ষার রাজনৈতিক চেতনা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

↓
২০০৭-এর নন্দীগ্রাম আন্দোলন

এটি কোনো সরল বা অনিবার্য ঐতিহাসিক পথ নয়। বরং প্রতিটি পর্যায়ে নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পুরনো অভিজ্ঞতাকে নতুন অর্থ দিয়েছে।

ধারাবাহিকতা ও স্মৃতির সমন্বিত ব্যাখ্যা : তেভাগা থেকে ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম পর্যন্ত ইতিহাসকে একদিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং অন্যদিকে সম্পূর্ণ অভিন্ন— এই দুই চরম অবস্থানের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। তেভাগা ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সরাসরি কারণ নয়। ২০০৭-এর আন্দোলন মূলত সমকালীন ভূমি অধিগ্রহণ ও শিল্পায়নের নীতির বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নন্দীগ্রামের দীর্ঘ কৃষক-প্রতিরোধের ইতিহাস, ভূমি সংস্কারের অভিজ্ঞতা এবং জমির সঙ্গে মানুষের গভীর সামাজিক সম্পর্ক আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি ও রাজনৈতিক চেতনা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হল — তেভাগা থেকে ২০০৭-এর নন্দীগ্রামের সম্পর্ক 'সরাসরি ধারাবাহিকতা'র চেয়ে 'ঐতিহাসিক স্মৃতি ও সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা' হিসেবে বেশি গ্রহণযোগ্য। তেভাগা কৃষককে শিখিয়েছিল যে উৎপাদনের উপর তার অধিকার আছে; পরবর্তী ভূমি সংস্কার সেই অধিকারকে আংশিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল; আর ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম দেখিয়েছিল যে কৃষক তার জীবন ও জীবিকার ভিত্তি—জমি—সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকেও রাজনৈতিক প্রশ্নে পরিণত করতে পারে। এই অর্থে তেভাগা এবং নন্দীগ্রাম দুটি পৃথক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হলেও তাদের মধ্যে একটি গভীর 'কৃষক-অধিকার চেতনার দীর্ঘ ইতিহাস' বিদ্যমান। নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে অতীতের প্রতিরোধের স্মৃতি শুধু স্মৃতি হয়ে থাকেনি; বিশেষ পরিস্থিতিতে তা বর্তমানের রাজনৈতিক প্রতিরোধকে অর্থ, পরিচয় এবং নৈতিক বৈধতা দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হয়েছিল। অতএব, 'তেভাগা থেকে ২০০৭' একটি সরল রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নয়; এটি ভূমি, কৃষক, অধিকার, স্মৃতি ও প্রতিরোধের দীর্ঘ সামাজিক ইতিহাস। এই দৃষ্টিভঙ্গিই নন্দীগ্রামের ইতিহাসকে তেভাগার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও গবেষণাসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

নন্দীগ্রামের ইতিহাসে কৃষক-প্রতিরোধের দীর্ঘ ধারাবাহিকতা : নন্দীগ্রামের ইতিহাসকে যদি দীর্ঘ সময়ের পরিসরে দেখা হয়, তাহলে সেখানে একাধিক কৃষক-প্রতিরোধের স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তরে রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। দ্বিতীয় স্তরে জমিদারি ও অবৈধ আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষক প্রতিরোধ। তৃতীয় স্তরে ১৯৪৬–৪৭-এর তেভাগা। চতুর্থ স্তরে স্বাধীনতার পর ভূমি সংস্কারের প্রক্রিয়া। এবং পঞ্চম স্তরে ২০০৭-এর জমি অধিগ্রহণ-বিরোধী আন্দোলন। এই ধারাগুলিকে একই ধরনের আন্দোলন বলা যাবে না। কিন্তু প্রতিটি পর্যায়ে ভূমি ও গ্রামীণ জীবনের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষত ২০০৭ সালের আন্দোলনের গবেষণায় নন্দীগ্রামের আগের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসকে স্থানীয় মানুষের ভূমির প্রতি গভীর 'attachment' বা আবেগগত সংযোগ বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা হয়েছে। এই কারণে নন্দীগ্রামকে কেবল ২০০৭-এর একটি রাজনৈতিক সংঘর্ষের স্থান হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়।[১০] এটি বাংলার কৃষক-রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল।

উপসংহার : তেভাগা আন্দোলন ছিল বাংলার কৃষকসমাজের ইতিহাসে এক মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা। এর কেন্দ্রীয় দাবি— ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ চাষির এবং এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিকের— ছিল অর্থনৈতিক ন্যায়ের দাবি। কিন্তু তার গভীরে ছিল উৎপাদনের উপর চাষির নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস এবং কৃষকের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। নন্দীগ্রামে এই আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছিল, কারণ অঞ্চলটির কৃষক সমাজের মধ্যে তেভাগার পূর্বেই জমিদারি শোষণ ও অবৈধ আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঐতিহ্য ছিল। ফলে ১৯৪৬-এর তেভাগা স্থানীয় কৃষকদের কাছে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে। ভূপাল পাণ্ডা, অনন্ত মাঝি এবং বিমলা মাজির মতো স্থানীয় নেতৃত্ব এবং কর্মীদের ভূমিকা আন্দোলনের সামাজিক বিস্তারকে শক্তিশালী করে। বিশেষত বিমলা মাজির নেতৃত্বে নারীদের সংগঠিত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 600 - 613
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করার ঘটনা প্রমাণ করে যে তেভাগা ছিল শুধু পুরুষ ভাগচাষিদের আন্দোলন নয়; গ্রামীণ নারীরাও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ছিলেন।

তেভাগা তার তাৎক্ষণিক সমস্ত দাবি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। কিন্তু বাংলার কৃষি-রাজনীতিতে এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। বর্গাচাষির অধিকার, জমির উপর কৃষকের নিরাপত্তা এবং ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন পরবর্তী দশকগুলিতেও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সঙ্গে তেভাগার সম্পর্ক তাই সরাসরি রাজনৈতিক উত্তরাধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। বরং দুটির মধ্যে একটি গভীর ঐতিহাসিক-সামাজিক সাদৃশ্য রয়েছে— ভূমিকে জীবিকা, সামাজিক অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ভিত্তি হিসেবে দেখা এবং সেই ভূমির উপর বাইরের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে নন্দীগ্রাম বাংলার কৃষক-আন্দোলনের ইতিহাসে একটি দীর্ঘস্থায়ী 'প্রতিরোধের ভূগোল'-এর অংশ। তেভাগা সেই ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; ২০০৭-এর আন্দোলন তার সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক যুগের আরেকটি অধ্যায়। দুইয়ের মধ্যে সরাসরি সমীকরণ নয়, বরং ভূমি-সম্পর্ক, কৃষক-চেতনা, স্থানীয় রাজনৈতিক স্মৃতি এবং প্রতিরোধের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান করাই নন্দীগ্রামের ইতিহাসকে অধিক গভীরভাবে বোঝার পথ। সুতরাং বলা যায়, তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস নন্দীগ্রামের অতীতকে ব্যাখ্যা করে এবং নন্দীগ্রামের পরবর্তী ইতিহাস তেভাগার দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক তাৎপর্যকে নতুন ভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়। বাংলার কৃষক-আন্দোলনের ইতিহাসে নন্দীগ্রামের গুরুত্ব এখানেই— এটি একই সঙ্গে কৃষক-অধিকার, ভূমি-সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের একাধিক ঐতিহাসিক স্তরকে ধারণ করে আছে।

Reference:

১. ধানাগারে, ডি. এন., "পিজেন্ট প্রোটেস্ট অ্যান্ড পলিটিক্স—দ্য তেভাগা মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (ইন্ডিয়া), ১৯৪৬–৪৭," *দ্য জার্নাল অব পিজেন্ট স্টাডিজ*, ভলিউম ৩, নং ৩, ১৯৭৬, পৃ. ৩৬০–৩৭৮

২. ধানাগারে, ডি. এন., *পিজেন্ট মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া, ১৯২০–১৯৫০*, দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩, পৃ. ২৫–৫৩; ২৩০–২৫০

৩. কাস্টার্স, পিটার, *উইমেন ইন দ্য তেভাগা আপরাইজিং: রুরাল পুওর উইমেন অ্যান্ড রেভলিউশনারি লিডারশিপ, ১৯৪৬–৪৭*, কলকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃ. ১৭–৬৪; ১২৪–১৩০

৪. সেন, সুনীল কুমার, *অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাগল ইন বেঙ্গল, ১৯৪৬–৪৭*, নিউ দিল্লি: পিপলস পাবলিশিং হাউস, ১৯৭২, পৃ. ১–২০; ১৫০–১৮৯

৫. বোস, সায়নী, "অ্যাটাচমেন্ট টু প্লেস অ্যান্ড টেরিটোরিয়ালিটি ইন নন্দীগ্রাম ল্যান্ড স্ট্রাগল, ইন্ডিয়া," *হিউম্যান জিওগ্রাফি*, ভলিউম ১৩, নং ২, ২০২০, পৃ. ১৩৯–১৫৩

৬. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, "ডিসপ্লেসমেন্ট, রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড কালেক্টিভ মোবিলাইজেশন," *সোশ্যাল মুভমেন্ট*, ইনফ্লিবনেট ই-কনটেন্ট, চ্যাপ্টার ২১, সেকশন ৭.১ – ৭.৪

৭. বেরা, রাজীব, "উইমেন'স পার্টিসিপেশন ইন দ্য তেভাগা মুভমেন্ট: কনটেক্সট অব মিডনাপোর ডিস্ট্রিক্ট," *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স স্টাডিজ*, ভলিউম ১২, স্পেশাল ইস্যু, ২০২৫, পৃ. ১১

৮. ধানাগারে, ডি. এন., "পিজেন্ট প্রোটেস্ট অ্যান্ড পলিটিক্স—দ্য তেভাগা মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (ইন্ডিয়া), ১৯৪৬–৪৭," *দ্য জার্নাল অব পিজেন্ট স্টাডিজ*, ভলিউম ৩, নং ৩, পৃ. ৩৬০–৩৭৮

৯. বোস, সায়নী, "অ্যাটাচমেন্ট টু প্লেস অ্যান্ড টেরিটোরিয়ালিটি ইন নন্দীগ্রাম ল্যান্ড স্ট্রাগল, ইন্ডিয়া," *হিউম্যান জিওগ্রাফি*, ভলিউম ১৩, নং ২, ২০২০, পৃ. ১৪২–১৪৮

১০. কাস্টার্স, পিটার, "উইমেন'স রোল ইন দ্য তেভাগা মুভমেন্ট," *মানুষি*, ইস্যু ৩২, পৃ. ১৪–২০